দ্বিতীয় প্রবাস - ৩

ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক

আগের সংখ্যাটি পড়ার জন্যে এখানে টোকা মারুন

সানফ্রান্সিস্কোতে আমাদের প্রায় তিন ঘন্টার মত যাত্রা বিরতি। নামার আগে এই সময়টা কাটাবো কেমন করে এ নিয়ে ভাবনা হচ্ছিল। পৃথিবীর এই অংশে এখন প্রখর রৌদ্রদগ্ধ দিন হলেও আমাদের ছেড়ে আসা ভুবন সিডনীতে এখন মধ্য রাত। ভয় ছিল ঘুমিয়ে গিয়ে আমরা ন আবার শিকাগোর প্লেন মিস করে ফেলি। কিন্তু বেশ আজব ভাবেই আমাদের সে দুশ্চিন্তা দূর হয়ে গেল। ইমিগ্রেশন থেকে ছাড়া পেতে বেশী সময় না লাগলে ও মালপত্র হাতে পেতেই একঘন্টার বেশী সময় লেগে গেল। এরপর কাস্টমসের ঝামেলা মিটিয়ে ইউনাইটেড এয়ারলাইনসের শিকাগোগামী প্লেনের জন্য মালপত্র জমা দিতে গেলাম। ৯/১১ এর পর আমেরিকার আভ্যন্তরীন কোন ফ্লাইটে তালা দেওয়া সুটকেস নিয়ে ভ্রমন করা যায়না। আমাদের চার সুটকেসের আটখানা তালা খুলে এগুলোকে জমা দিতেও লাগলো বেশ কিছু সময়। এবারে সিকিউরিটি চেকের পালা। গায়ের জ্যাকেট, জুতা ও বেলট খুলে আর সেই সাথে কম্পিউটার এবং হাতের অন্যান্য ব্যাগেজ এক্সরে মেশিনে জমা দিয়ে বিশাল দর্শন এক মহিলা রক্ষীর মেটাল ডিটেক্টরের আপাদমস্তক নিরীক্ষা শেষে যখন আমরা যখন বোর্ডিং গেটে এসে পৌঁছলাম তখন প্লেন ছাড়ার আর মাত্র ঘন্টাখানেক বাকী।

স্থানীয় সময় দু'টো বেজে পাঁচ মিনিটের সময় শিকাগো গামী প্লেন ছাড়ার কথা ছিল, কিন্তু তা ছাড়লো পৌনে তিনটায়। ক্যাপ্টেন জানালেন প্লেন ছাড়তে দেরী হলেও গন্তব্যে পৌঁছতে দেরী হবেনা; নির্ধারিত ফ্লাইট টাইম তিন ঘন্টা ছাপ্পান্ন মিনিটের জায়গায় পৌঁছাতে সময় লাগবে সাড়ে তিন ঘন্টা। আমেরিকার আভ্যন্তরীন ফ্লাইটে খাবার কিনে খেতে হয়। আমরাও তাই খেলাম। শিকাগো সময় সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় প্লেন শিকাগো বিমানবন্দরে নামলো; কিন্তু আমাদের আগে ল্যান্ড করা আরো বহু বিমানের কিউতে পরে টারমিনাল ভবনে পৌঁছুতে সাড়ে আটটা বেজে গেল। আমাদের এই যাত্রার শেষ গন্তব্য ডেট্রয়েটের প্লেন ছাড়ার কথা রাত সাড়ে ন'টায় বেশ দুরের এক গেট থেকে। তাই দৌড়ুতে হোল। এবারে আর বড় প্লেন নয়, আর ফ্লাইট টাইম ও মাত্র পন্চাশ মিনিট। কিন্তু যথা সময়ে প্লেন ছাড়লো না; প্রায় বিশ মিনিট পর অন্য একটি কানেক্টিং ফ্লাইটে এই প্লেনের তিরিশ জন যাত্রী আসার পর আমরা অবশেষে রওয়ানা হলাম।

কিন্তু হা হতোষ্যি, আমাদের ভাগ্য খারাপ; রানওয়েতে দশ মিনিট ট্যাক্সি করার পর পায়লট জানালেন যে প্লেনে কিছুযান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিয়েছে এবং ঐ ত্রুটি সারিয়ে তবেই ফ্লাইট রওয়ানা হবে। আমরা বেশ চিন্তায় পরে গেলাম। আমাদের জামাই নোমান জানে আমরা রাত সাড়ে এগারোটায় ডেট্রয়েট পৌঁছাবো। ও বেচারাতো নিশ্চয়ই মহা ভাবনায় পরবে। কিন্তু কিছু তো আর করার ও নেই; অতএব অদৃষ্টের হাতে নিজেদের সঁপে বসে রইলাম। পূর্বনির্ধারিত ছাড়ার সময়ের দু'ঘন্টা পর ত্রুটিমুক্ত প্লেন নিয়ে আমরা যখন আমাদের গন্তব্যে পৌঁছালাম তখন রাত দেড়টা বেজে গেছে। শুনলাম এটাই সে রাতের শেষ ফ্লাইট। আর সম্ভবতঃ তাই ডেট্রয়েট মেট্রো এয়ারপোর্ট প্রায় জনশূন্য। বিমানবন্দর থেকে মিডল্যান্ড শহরে আমার মেয়ে সোনিয়ার বাসা প্রায় দুইঘন্টার ড্রাইভ। প্রায় জনশূন্য দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে যখন বাসায় এসে পৌঁছালাম তখন সময় ভোর পৌনে চারটা। হাতমুখ ধুয়ে অষুধ খেতে হবে বলে সামান্য খেতে হল। তারপর সটান বিছানা।

যখন ঘুম ভাংলো, মিডল্যান্ডে তখন সোমবারের দুপুর সাড়ে এগারোটা; সিডনীতে অবশ্য তখন সোমবারের রাত সাড়ে ন'টা। ঘুমাতে পেরে দীর্ঘ ভ্রমনের ক্লান্তি দূর হয়েছে বলবো না, তবে ঘুম থেকে জেগে গোসল করার পর শরীর মোটামুটি ঝরঝরে লাগছে। মেয়ে সোনিয়া কাজে যায়নি, তবে জামাই নোমানকে যেতে হয়েছে কারণ সেদিন সকাল সাড়ে আটটায় তার খুব জরুরী মিটিং রয়েছে। খুব খারাপ লাগছিল। আগেই বলেছি আগের দিন রাতে আমাদেরকে এয়ারপোর্ট থেকে তুলে বাসায় ফিরতে সকাল পৌনে চারটে হয়ে গিয়েছিল। চার ঘন্টার ও কম সময় ঘুমিয়ে সকাল সাড়ে সাতটায় মিটিং এ যোগ দেয়া খুব সহজ ব্যাপার নয়। সোনিয়ার ডকে খাবার টেবিলে এসে দেখি নাতি জিবরান এবং নাতনী মিড়েয়া তাদের নিয়মের ব্যতিক্রম করে নানা-নানুর সাথে নাস্তা খাবার জন্য অপেক্ষা করছে। জিবরানের বয়স এখন দশ আর মিড়েয়ার সাত। এখন আমেরিকায় সামার চলছে; সব স্কুলে এখন ছুটি। সেপ্টেম্বরে স্কুল খোলার পর থেকে জিবরান তার পঞ্চম গ্রেড শুরু করবে, আর মিড়েয়ার শুরু হবে দ্বিতীয় গ্রেড। আমাদের পেয়ে তারা দুজনেই খুব খুশী কেননা আমরা যতদিন এখনে আছি ততদিন ওদের আর ডে-কেয়ারে যেতে হবে না। নোমান - সোনিয়া ও খুব খুশী, ওরাও চায় বাচ্চারা নানা-নানুর আদর পেয়ে বড় হোক।

আমেরিকা তথা উন্নত বিশ্বের দেশগুলিতে বাচ্চাদের এই এক সমস্যা। ভাল ভাবে বেঁচে থাকার তাগিদে বাবা-মা দুজনকেই যেহেতু চাকুরী করতে হয়, সামারে স্কুল ছুটির সময়টাতেও সত্যিকার অর্থে ছোট বাচ্চাদের কোন ছুটি হয়না। যথারীতি সকালে ঘুম থেকে উঠে এরা বাবা অথবা মায়ের সাথে ডে-কেয়ার সেন্টারে যায়। সেখানে তাদেরই মতো অন্যান্য বাচ্চাদের সাথে রুটিন মাফিক দিন কাটিয়ে অফিস ফেরৎ বাবা কিংবা মায়ের সাথে বাসায় ফিরে আসে। সেই থোড় বড়ি খাড়া; খাড়া বড়ি থোড়। সারা বছরের ছক বাঁধা জীবনের সাথে তফাৎ শুধু মাত্র এটুকুই যে স্কুলের নিত্যদিনের পড়ার চাপ থেকে এ সময়টা তারা মুক্ত থাকে। এ যেন রবোটের মত এক বৈচিত্রহীন যান্ত্রিক জীবন। এরা যেন এক ভিন গ্রহের মানুষ সাথে যাদের শৈশবের সংজ্ঞা

আমার প্রজন্মের মানুষদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। আমার শৈশবের ছুটি ছিল নানা কিংবা ফুপুর বাড়ীতে বেড়াতে যাওয়া; কাকাদের সাথে খেতের আল ধরে ছোটা; বনে বাদাড়ে ঘুরে পাখীর বাসা খোঁজা; কোচর ভর্তি বেথুল কিংবা বৈঁচি ফলের সম্ভার নিয়ে বাড়ী ফিরে এসে মায়ের কান-মলা খাওয়া; ঘুড়ি ওড়ানো এমনি আরো কত কি। আমাদের শৈশব তো দূরের বাদ্য, এদের সাথে আমার সন্তানদের শৈশবের ও কোন মিল নেই। সোনিয়া আমার এবং আমার শ্বশুর পরিবারের প্রথম নাতনী হওয়ার সুবাদে তার জীবনের প্রথম ছয় বৎসর দাদা-দিদা কিংবা নানা-নানু ছাড়াও সংগী হিসেবে অনেক চাচা, মামা, ফুপু, খালাদের পেয়েছিল। তারপর আমরা সুদানের রাজধানী খার্তুমে চলে যাই। খার্তুমের উপশহর কূটনৈতিক আবাসিক এলাকা 'এল আমারাতের' যে ফ্ল্যাট বাড়িটাতে আমরা থাকতাম, সেখানে বিভিন্ন দেশের আরো পনেরোটি পরিবার থাকতো। সেখানে আমাদের মেয়ে সোনিয়া আর ছেলে শেরিফের সমবয়সী আরো অনেক ক'টি বাচ্চা থাকায় তাদের শৈশব ও বেশ আনন্দময় ছিল। তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত খার্তুম ছেড়ে এরপর আমরা যখন দ্বিতীয় বিশ্বের দ্রুত উন্নয়নগামী সিংগাপুরে চলে এলাম, তখন প্রথম বারের মতে আমাদের দুই সন্তানই একটু চাপের সন্মুখীন হয়। কিন্তু সে সময় আমার স্ত্রী যেহেতু কোন চাকুরী করতেন না; স্কুল ছুটির দিনগুলোতে তার সারাটা সময়ই ছিল আমাদের দুই সন্তানের জন্য। কিন্তু সে তো কবেকার কথা; আজ সেই রাম ও নেই, নেই সে অযোধ্যা ও। 'পৃথিবী বদলে গেছে' আর তাই তো 'যা দেখি নুতন লাগে'। বদলে গেছে পৃথিবীর মানুষ, তাদের জীবন আর জীবন যাপনের সামগ্রীক ধ্যান-ধারণা।

আমার স্ত্রী চাইলড কেয়ারে ডিপ্লোমা প্রাপ্তা; সিডনীতে তিনি চাইলড কেয়ার সেন্টারেই কাজ করেন। তিনি অত্যন্ত ধৈর্যশীলা এবং সব বাচ্চাদেরই খুব প্রিয় মানুষ। আমাদেরে ভাগনা, ভাগ্নী, কিংবা ভাতিজা-ভাতিজীদের সবাই ফুপী, চাচী, মামী অথবা খালা বলতে অজ্ঞান। এই ছুটিতে আসার আগেই তিনি ঠিক করেছিলেন যে মিডল্যান্ডে আমাদের অবস্থানের পুরো পঁচিশ দিন সময়ই তিনি জিবরান আর মিড়েয়ার সাথে কাটাবেন এবং তাদের মোটামুটি বৈচিত্রহীন শৈশবের অন্তত কিছুটা সময় আনন্দে ভরে দেবেন। এ দিকে তাকে পেয়ে নাতি-নাতনীর ও আনন্দের শেষ নেই। তাদের বেশ মনে আছে দু'বৎসর আগে সিডনী বেড়াতে গেলে নানু তাদেরকে গাছ থেকে টাটকা লেবু পেড়ে এনে লেমন জুস বানানো শিখিয়েছিলেন। এ ছাড়া গত বৎসর নানা-নানু যখন মিডল্যান্ডে বেড়াতে এসেছিলেন, তখন তিনি অনেক উপহার নিয়ে এসেছিলেন। তখন নানু সব সময় তাদের সাথে খেলা করতেন। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে নানা-নানু একমাত্র মানুষ যারা বাবা-মাকেও বকা দিতে পারেন ! তাই কতক্ষনে নাস্তা খাওয়া শেষ হবে, আর নানু তাদের জন্য সিডনী থেকে বয়ে আনা উপহার সামগ্রী তাদের হাতে তুলে দেবেন, তাদের সাথে খেলা করবেন এটাই দু'ভাইবোনের একমাত্র চিন্তা বলে মনে হোল। বেশ হৈ হুল্লোরের মধ্যেই নাস্তা শেষ হলো। স্ত্রী তার নাতি-নাতনীদের নিয়ে খাবার ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। আর আমি সেদিনের সংবাদ শোনার জন্য টেলিভিশনের সি এন এন চ্যানেল টিউন করে বসলাম।

আজকাল খবর শোনা এক বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা। আর সে খবরের সুত্র যদি আমেরিকার সি এন এন চ্যানেলে কিংবা ফক্স চ্যানেল হয় তা হলে তো আর কথাই নেই। বা-লাদেশ টেলিভিশন বিটিভিকে যেমন অনেকেই বাজে (বি) টেলিভীষন (টিভি) বলেন, তেমনি সি এন এন কে আমি বলি কমপ্লিটলী (সি) ননসেন্সিকাল (এন) নিউজ (এন) চ্যানেল ! মোটামুটি ভাবে পশ্চিমা দেশের প্রায় সব প্রচার মাধ্যমই মুসলামন এবং ইসলাম বিদ্বেষী। ৯/১১ এর পর থেকে এই বিদ্বেষ বহুল পরিমাণে বেড়েছে। নিঃসন্দেহে ফক্স চ্যানেল এ ব্যপারে চ্যাম্পিয়ন; তবে আমার মনে হয় সি এন এন চ্যানেলটির ভুমিকাও এই ব্যাপারে খুব কম নয়। এই চ্যানেলটির কৌশলী কিন্তু বল্গাহীন মুসলমান এবং ইসলাম বিরোধী অপপ্রচারের সহজ সরল মানে হচ্ছে মুসলমান মানেই হচ্ছে সন্ত্রাসী, আতংকবাদী। এদেরকে ধ্বংস করা আমেরিকা এবং ইউরোপের নৈতিক দায়িত্ব। যে সব মুসলমান 'বুসলমান' (বুশপন্থী মুসলমান) না হবে, তাদের মেরে ফেলাই উচিৎ। মুসলমানেরা অবশ্যই মানুষ নয়। তাদের সকলেই সন্ত্রাসী। গাজার প্যালেস্টিনীয় কিশোরটি যখন তার মাতৃভুমি উদ্ধারের জন্য আত্মাহুতি দেয়, তখন তার পরিচয়ও হয় সন্ত্রাসী; আর যখন তার জমি গ্রাসকারী ভুমিদস্যু ইসরায়েলী ইহুদী হার্মাদটি মরে তখন সে পরিচিত হয় গণতন্ত্র আর বিশ্বশান্তি রক্ষাকারী সৈনিক হিসেবে!হায়রে পশ্চিমি সভ্যতার ন্যায়নীতির মানদন্ড!

সিডনীতে থাকাকালীন সময়ে আমি কখনোই সি এন এন চ্যানেল দেখতাম না। কিন্তু এ বাসায় বিবিসি দেখার ব্যবস্থা না থাকায় বাধ্য হয়ে এই জঘন্য একপেশে সংবাদ পরিবেশনকারী চ্যানেলটিই আমাকে দেখতে হচ্ছে। আজকের খবর অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট বুশের মতে মানবতার খাতিরেই লেবাননে ইসরায়েলী আগ্রাসন অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত । তিনি চান যে লেবানন - ইসরায়েল সীমান্তের সব মানুষই হিজবুল্লাহ গেরিলা এবং তাদেরকে সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংস না করা পর্যন্ত ইসরায়েলের যুদ্ধ চালিয়ে যাক। ইসরায়েল নামক রাস্ট্রটিকে অবশ্যই বাঁচিয়ে রাখতে হবে - হোক না তা যে কোন মূল্যের বিনিময়ে। বিশ্বের সকল মানুষের এটাই চাওয়া উচিৎ বলে বুশ সাহেবের বিশ্বাস। তিনি ইরান এবং সিরিয়ার উপর বড়ই নাখোশ; আমেরিকা অবশ্যই তার পোষ্য এবং তাবেদার রাস্ট্র ইসরায়েলকে অস্ত্র সরবরাহ করবে; কিন্তু তা বলে ইরান কি হিজবুল্লাহকে দূর পাল্লার রকেট জোগাবে? ছিঃ এ অন্যায়, এ ঘোরতর অন্যায়।

চলবে - -

(ডঃ মোহাম্মদ আবদুর রাযযাক ইউনিভার্সিটি অফ নিউ সাউথ ওয়েলসের মার্কেটিং বিভাগে অধ্যাপনা করছেন। এই রচনাটি আমেরিকাতে তার দ্বিতীয়বার অবস্থানের অভিজ্ঞতার বিবরণ।)